দেশের অনেক স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। জানা যায়, সারাদেশে ৬৫ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩২ হাজারের বেশি উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার বেশিরভাগ ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোনো মুহূর্তে পরিত্যক্ত ভবন ধসে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। জানা যায়, সারাদেশে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় তিন সহস্রাধিক। ডিজিটাল বাংলাদেশের শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান শাসনামলে এমন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজও থাকতে পারে এটা বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিদিন সকালে শিশুরা এসে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন থেকে বেঞ্চ বের করে। ছুটির পর আবার বেঞ্চগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে তারা বাড়ি ফেরে। তবে বৃষ্টি এলে বাধ্য হয়েই আশ্রয় নিতে হয় পরিত্যক্ত ভবনে। যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। অনেকে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আসতে দিতে চান না। এতে দিন দিন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমছে। পলেস্তারা খসে পড়ায় ভবনটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা ভয়ে ভয়ে ক্লাস করে থাকে। ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় অনেক অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে আসতে দিতে চান না। উপস্থিতিতে ক্লাস চলাকালে ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে তার মাথার ওপর পড়েছে। অনেক শিক্ষার্থীর ওপরও পড়েছে। এ নিয়ে ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ভয়ে থাকে। ফলে তারা ক্লাসে ঠিকমতো মনোযোগী হতে পারে না। দ্রুত এ ব্যাপারে একটা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয় ভবনগুলো দূর থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই, কিন্তু ভেতরে গেলে চোখে পড়ে ছাদে ও দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ার চিত্র। ভবনগুলোর সব কক্ষই ঝুঁকিপূর্ণ। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন জেনেও সেখানে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় কুমিল্লার মুরাদনগর একটি বিদ্যালয়ের ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় ২০১৩ সালে। ৯ বছর ধরে ভাড়া করা ঘরে পাঠদান করা হচ্ছিল। কিন্তু গত দুই মাস ধরে সেই পরিত্যক্ত ভবনের সামনের গাছতলায় চলছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান। এতে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই চিত্র দেখা গেছে মুরাদনগর উপজেলার বাবুটিপাড়া ইউনিয়নের রামপুর দক্ষিণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়টি ১৯৪০ সালে স্থাপন করা হয়। ওই সময় টিনের চালা দিয়ে কোনোরকমে পাঠদান করা হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে একটি একতলা ভবন করা হয়। এরপর গত ৫০ বছরেও এ বিদ্যালয়ে অন্য কোনো ভবন বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। ২০১০ সালে একটি ভবন বরাদ্দ হলেও মাঠ ভরাটের অভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি। পুরনো একমাত্র ভবনটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ২০১৩ সালে এ ভবনটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এর পর পাশের চন্দন ডাক্তার ও হিন্দু বাড়িতে পাঠদান করা হয়। ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ের ভরাট করা মাঠের গাছতলায় চলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। জানা যায়, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষেরই ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে রড বেরিয়ে গেছে। কক্ষের দেয়াল ও পিলারগুলোতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ২০১৩ সালে এ বিদ্যালয়ে ৪২৩ জন শিক্ষার্থী ছিল। ভবন না থাকায় লেখাপড়া করতে কষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীরা আশপাশের অন্য বিদ্যালয়ে চলে গেছে। অনেকে লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়েছে। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮০। বিদ্যালয়ের অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দ্রুত একটি ভবন বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেছে। পুরনো একমাত্র ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার ৯ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন ভবন নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমানে বিদ্যালয় মাঠের গাছতলায় চলছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান। মুরাদনগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফওজিয়া আক্তার বলেন, ভবন পেতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে চাহিদা পাঠানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ৯ বছর ধরে ভাড়া করা ঘরে পাঠদান করা হচ্ছিল। কিন্তু দুই মাস ধরে সেই পরিত্যক্ত ভবনের সামনের গাছতলায় চলছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান। এতে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

advertisement

এ ধরনের ঘটনা শুধু এটাই প্রথম নয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সচিত্র খবর আমরা পত্রিকার পাতায় দেখতে পাই। যা আমাদের বেশ ভাবনায় ফেলে দেয়। একইরকম চিত্র জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ১৩৭ নম্বর খোশকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও। এ প্রতিষ্ঠাটি নির্মিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। অদ্যাবধি সংস্কার না করায় প্রতিদিন ছাদের সিলিং, বিম এবং দেয়াল থেকে খসে পড়ছে আস্তর, খোয়া, বালি ও পাথরকণা। যে কোনো সময় ভবনটি ধসে পড়তে পারে। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে পাবনা জেলায়ই ৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর খুব উদ্বেগজনক। কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্যান্য জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোও। একই অবস্থা রংপুরের তারাগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোরসহ দেশের অন্যান্য জেলার স্কুলগুলোতে। রোদ ও মেঘ হলেই ¯ুলে ছুটি, এ অবস্থায় সরকারকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমস্যার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। সামনে শীতকাল। ইতোমধ্যে উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। স্থানীয় প্রশাসন বিদ্যালয়গুলোর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের আবেদন জানিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখেও জবাব পায়নি। মুরাদনগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফওজিয়া আক্তার বলেন, ভবন পেতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে চাহিদা পাঠানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুমিত্রা পাল দৈনিক আমাদের সময়কে বলেন, বিদ্যালয় ভবন, আসবাবপত্রের অভাব থাকলেও প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করছে। এর মধ্যে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ৩ জন করে ৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে দুজন বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। পুরনো একমাত্র ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার ৯ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন ভবন নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমানে বিদ্যালয় মাঠের গাছতলায় চলছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান।

advertisement 4

উপকূলের বিভিন্ন জেলায় এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেশি। অনেক সময় দুর্ঘটনার খবর আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ২০১৯ সালে বরগুনার তালতলী উপজেলায় শ্রেণিকক্ষের ছাদের পলেস্তারা খসে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন দেশের অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে ঝুঁকিমুক্ত করার দাবি তুলেছেন অভিভাবকরা। সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সেগুলো দ্রুত সংস্কার করে শিক্ষাদানের পরিবেশ নিশ্চিত করুন।

শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিক। প্রতিবছরই বাজেটে শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা- সবস্তরেই মানসম্মত ও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে তার নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে তিনি উদ্যোগ নিচ্ছেন। আর এজন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষার প্রধান অনুষঙ্গ ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ এবং নির্মল শিক্ষার পরিবেশ। কিন্তু এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থাকলে শিক্ষাদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। আমরা আশাবাদী দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীবান্ধব হবে, নিরাপদ হবে ও ঝুঁকিমুক্ত হবে।

সৈয়দ ফারুক হোসেন : রেজিস্ট্রার, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়